আমিষ ভোজন

- আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

আমিষ ভোজনের কর্ত্তব্যতা লইয়া অনেক বিচার হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধেও যে মীমাংসা হইবে, লেখকের এরূপ দুরাশা নাই। তিন দিকে হইতে এই বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হয়। শরীর রক্ষার কথা বিজ্ঞানের বিষয়, খরচের কথা অর্থশাস্ত্রের বিষয়, তারপর ধর্মাধর্মের কথা।

বিজ্ঞানের কথাটা আগে শেষ করা যাক। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, মনুষ্যশরীরের উপাদান অনেকটা কয়লা, অনেকটা জল, খানিকটা ছাই। কাজেই খাদ্য সামগ্রীতে এই তিন পদার্থ থাকা দরকার। তিন উপাদানের মধ্যে কয়লাটা এক অর্থে প্রধান। শরীরের তাপ রক্ষার জন্য কয়লা পোড়াইতে হয়, কাজকর্ম্ম করিতে হইলে কয়লা পোড়াইতে হয়, সেই জন্য শরীরের মধ্যে প্রতিনিয়ত কয়লা পোড়ে। শরীর একটা এঞ্জিন সদৃশ। সেই এঞ্জিনটা গঠন করিতে খানিকটা কয়লা ও ছাই ও জলের প্রয়োজন। এই তিন সামগ্রী একত্রযোগে মনুষ্যশরীর নির্ম্মাণে লাগে।

দুঃখের বিষয়, আমরা কয়লা ও ছাই, এই দুই পদার্থ হজম করিতে পারি না, অন্য উপায়ে শরীরমধ্যে গ্রহণ করি। উদ্ভিদেরা বায়ু হইতে কয়লা সংগ্রহ করে, মাটি হইতে ছাই ও জল সংগ্রহ করে। এই তিন পদার্থ মিশিয়া জটিল উদ্ভিদদেহ নির্ম্মিত হয়। প্রাণী আবার উদ্ভিদদেহ আত্মসাৎ করিয়া এই তিন পদার্থকে আরও জটিলতর করিয়া মিশাইয়া ফেলে ও আপন শরীর নির্ম্মাণ করে। সামান্য কয়লা, ছাই ও জলকে উদ্ভিজ্জে পরিণত করিতে বিশেষ প্রয়াস আবশ্যক, স্বয়ং সূর্যদেব ইহাতে সহায়। উদ্ভিদদেহকে প্রাণীদেহে পরিণত করিতেও প্রয়াসের দরকার; কিন্তু প্রাণীদেহকে প্রাণীদেহে পরিণত করিতে তত প্রয়াস লাগে না। প্রাণীর দুই শ্রেণী। এক শ্রেণী নিরুপায় ও নির্ব্বোধ; ইহারা কায়ক্লেশে উদ্ভিজ্জ আহার করিয়া উদ্ভিদদেহকে প্রাণীদেহে পরিণত করে। আর এক শ্রেণী চালাক; ইহারা বিনা আয়াসে বা অনায়াসে অন্য প্রাণীর দেহকে আত্মসাৎ করিয়া নিজদেহে পরিণত করে। উদ্ভিজ্জ হইতে প্রাণীদেহ নির্ম্মানে যতটা কষ্ট, এক প্রাণীর দেহ কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া অন্য প্রাণীর দেহে পরিণতি পাইতে তত কষ্ট নাই। মোটের উপর মাংস হজম সহজ; উদ্ভিদ হজম করা কষ্টসাধ্য। উদ্ভিজ্জাশী মাটি হইতে খরচ করিয়া ইট তৈয়ারি ইট সংগ্রহ করিয়া গৃহ নির্ম্মান করেন। উপমাটা অবশ্যই অত্যন্ত মোটাগোছের হইল।

ফলে উদ্ভিজ্জ খাদ্যের অনেকটা বর্জ্জন করিতে হয়; বাকীটাকেও প্রয়াস সহকারে রক্তমাংসাদিতে পরিণত করিতে হয়। প্রাণিজ খাদ্যে ততটা বর্জনীয় অংশও নাই, পরিণতির প্রয়াসটাও কম। এ সকল শরীরবিজ্ঞানসম্মত স্থুল কথা; ইহা লইয়া বিবাদ করিলে চলিবে না। সংক্ষেপে ইহার অর্থ এই যে, একরাশি

উদ্ভিজ্জ ভোজনে যে ফল, অল্প মাত্র মাংস ভোজনেও সেই ফল। রাশি রাশি পদার্থ ভোজন করিতে হয় বলিয়াই প্রধান প্রধান উদ্ভিজ্জাশী জন্তুর পাকযন্ত্রও প্রকান্ড। গরু, মহিষ, ঘোড়া, উট প্রভৃতি উদাহরণ। প্রধান প্রধান মাংসাশী জীবের পাকযন্ত্রও ছোট, শরীরও ছোট। সিংহ ব্যাঘ্রাদি উদাহরণ। এই হিসাবে আমিষ ভোজনে লাভ; উদ্ভিজ্জ ভোজনে লোকসান।

কোন কোন উদ্ভিদের কোন কোন অংশ প্রায় মাংসের মতই পুষ্টিকর হইতে পারে। ছোলা, মুগ, মুসুরী, কলাই প্রভৃতি পদার্থ উদাহরণ। কৃষি দ্বারা এই সকল পষ্টিকর উদ্ভিজ্জ কতক পাওয়া যায়। আবার রসায়নসম্মত উপায়ে সাধারণ উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে মাংসের মত বা মাংসের অপেক্ষাও পুষ্টিকর পদার্থ তৈয়ার করা না যাইতে পারে, এমন নহে। কিন্তু কৃষিলব্ধ ও রাসায়নিক উপায়লব্ধ পুষ্টিকর খাদ্য সম্প্রতি তেমন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। কাজের সেই উপদেশ নিষ্ফল।

মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য কী? উদ্ভিজ্জের মধ্যে ধান, গম প্রভৃতি শষ্য, ছোলা, মুগ, প্রভৃতি কলাই ও নানাবিধি ফল মূল সম্প্রতি মানুষ্যের খাদ্য। এই সমস্ত দ্রব্য কৃষিলব্ধ। মনুষ্যের আদিম অবস্থায় এ সকল দ্রব্য পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিল না, মনুষ্য কৃষিবিদ্যা দ্বারা এ সকলের এরকম সৃষ্টি করিয়াছে বলা যাইতে পারে। উদ্ভিজ্জাশী ইতর জন্তু ঘাস, পাতা খায়, তা মনুষ্যের পাকযন্ত্রের উপযোগী নহে। কাজেই মনুষ্যের আদিম কালে প্রাণীজ খাদ্যই প্রধান ছিল সন্দেহ নাই, একালেও অসভ্য ও বন্য মনুষ্য মৃগয়াজীবী। যাহাদের পশুপালন জীবিকা, তাহাদেরও প্রধান খাদ্য পশু মাংস। পশুহত্যার সাহায্যের জন্যই আরণ্য বৃকের কুক্কুরত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। ভোজনার্থই গোমেষাদি পশু গ্রামত্ব লাভ করিয়াছে। ফলে মনুষ্যের স্বাভাবিক খাদ্য প্রাণীমাংস। প্রাণীমাংস যেখানে কুলায় নাই, যেখানে ভূমি উর্বরা ও প্রকৃতি অনুকূল, সেইখানে মনুষ্য বুদ্ধির জোরে কৃষিবিদ্যা সৃষ্টি করিয়া বিবিধ আরণ্য অখাদ্য উদ্ভিজ্জকে মনুষ্য উপযোগী খাদ্য দ্রব্য উৎপাদনে সমর্থ করিয়া লইয়াছে। তথাপি

কৃষিজীবী সভ্যতম সমাজেও মনুষ্য অদ্যাপি বহুল পরিমাণে মাংসভোজী, তাহার কারণ কী? সভ্য সমাজে জনসংখ্যা এত বেশী যে, কৃষিজাত দ্রব্যে কুলায় না। সেই জন্য ঘাস, পাতা প্রভৃতি যে সকল উদ্ভিজ্জ মানুষের অখাদ্য, তাহাকে পশু সাহায্যে পশুমাংসে পরিণত করিয়া মনুষ্য কাজে লাগায়। সভ্য সমাজে মানুষ উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ খাদ্য প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিতেছে, তথাপি কুলাইতেছে না; সভ্যতম সমাজেও বিস্তর লোক অর্দ্ধাশনে বা অনশনে থাকে। তাহার মূল কারণ আহারসামগ্রীর অপ্রাচুর্য্য। তিনটা কথা পাওয়া গেল। মাংস উদ্ভিজ্জের অপেক্ষা পুষ্টিকর, মাংস মনুষ্যের নির্দিষ্ট খাদ্য; কৃষিজাত উদ্ভিজ্জ কোন সমাজের পক্ষে যথেষ্ট ও প্রচুর নহে। সুতরাং মনুষ্যের প্রবৃত্তি মাংসের দিকে। মনুষ্য প্রাকৃত নিয়মে জীবন রক্ষার জন্য ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য মাংস ভোজনে বাধ্য।

এই কয়টি কথার প্রতিকূলে বিরোধ উত্থাপন ভ্রম। তথাপি কেহ কেহ বিবাদ তোলেন। কেহ বলেন অনেক নিরামিষাশী ব্যক্তিকে সুস্থ, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী দেখা যায়। এটা কোন কাজের কথা নহে। মনুষ্যের দীর্ঘজীবিত্ব ও স্বাস্থ্য এত বিভিন্ন কারণে নিয়মিত হয় যে, ব্যাক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষের উদাহরণ দ্বারা ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা চলে না।

কেহ দেখান, উদ্ভিজ্জাশী জীবজন্তু দীর্ঘজীবী; যেমন হাতী ঘোড়া, ইত্যাদি। এ কথাটাও বিজ্ঞানসম্মত নহে। জীববিজ্ঞান অনুরূপ ব্যাখ্যা দেয়। আহার ও পরমায়ুর মধ্যে সম্বন্ধ আছে সন্দেহ নেই। উপরেই বলিয়াছি উদ্ভিদজীবী জীবের কলেবরও বৃহৎ হয়, বৃহৎ কলেবরের সহিত দীর্ঘ পরমায়ুর একটা সম্বন্ধ আছে, তাহা জীববিজ্ঞান স্বীকার করে। ইহার ব্যাখ্যা হার্বার্ট স্পেন্সারের গ্রন্থে আছে। কিন্তু প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে কোন জাতির পরমায়ুর পরিমাণ একেবারে নির্দ্ধারিত হইয়া গেলে আর খাদ্য নির্ব্বাচন দ্বারা আর তাহার পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই। সংক্ষেপে এ তত্ত্ব বুঝান চলে না; ইহার ভিতরে অনেক কথা আছে।

এ পর্যন্ত গেল বিজ্ঞানের কথা। অর্থশাস্ত্র কী বলে দেখা যাউক। জীবনরক্ষা অত্যন্ত আবশ্যক ব্যপার, উদরের জ্বালার মত জ্বালা নাই। স্বাভাবিক কারণে মনুষ্যের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র; কারণ যত মানুষ আছে তত খাদ্য নাই। মাংস যেখানে সস্তা, মনুষ্য সেখানে মাংসই খাইবে; ইহাতে আপত্তি নিরর্থক। নিরামিষ ভোজনের পক্ষপাতী পাঠক এত ক্ষণ আমার উপর খড়্গহস্ত হইয়াছেন। কিন্তু মাভৈঃ। এখনও আশা আছে! এখনও ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা আছে। আমিষ আহার ধর্ম্মসঙ্গত কিনা , এ প্রশ্নের উত্তর আবশ্যক। সচরাচর এইরূপ উত্তর দেওয়া হয়, মাংস ভোজনে স্বভাব হিংস্র হইয়া থাকে। মাংসভোজী পশু হিংস্র, ক্রূর ও নিষ্ঠুর। কথাটা ঠিক নহে। মাংস খাইয়া সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র স্বভাব পাইয়াছে বলা সঙ্গত নহে। বয়স বাড়িলে ব্যাঘ্রের হিংস্রত্ব বাড়ে, তাহার প্রমাণ নাই। পুরুষান্যক্রমে তাহাদের নিষ্ঠুরতা বাড়িতেছে, তাহাও নহে। হিংস্র না হইলে ব্যাঘ্রের চলে না, সেই জন্য ব্যাঘ্র হিংস্র। নিরীহস্বভাব ব্যাঘ্রের এ জগতে স্থান নাই। প্রকৃতি ঠাকুরাণী যেদিন খর নখর ও খরতর দন্ত দ্বারা ব্যাঘ্রাবয়বকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, ঠিক সেই ক্ষণেই তাহার স্বভাবকে নিষ্ঠুর

করিয়া দিয়াছেন। মাংসাশী জন্তুর হিংস্র স্বভাব প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফল, মাংস ভোজনের আনুষঙ্গিক হইলেও মাংস ভোজনের ফল নহে। মাংস খাইলেই মাথা গরম ও রক্ত গরম হইবে, এমন কোন প্রমাণ নাই। তবে মাংস আহরণের সময় মাথা গরম ও রক্ত গরম হওয়া আবশ্যক, নতুবা মাংস সংগ্রহ চলে না। মনুষ্যের পক্ষেও তাহাই। মাংস খাইলেই যে প্রকৃতি ক্রূর হইবে, তাহা নহে; তবে যাহাদের মাংস না হইলে চলে না, তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া ক্রূর হইতে হয়। মাংস সংগ্রহ ব্যাপারটাই নিষ্ঠুর কাজ। মাংস একবার উদরগত হইলে যে ক্রূরতা বাড়াইবে, তাহার কোন কথা নাই। যাহার মাংসই প্রধান খাদ্য, যাহাকে মাংস সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে, তাহার ব্যবসায় নিষ্ঠুর না হইলে চলিবে না। মাংস ভোজনের ফলে মনুষ্য নিষ্ঠুর হয় না, উগ্রস্বভাবের হয় না। শরীরবিজ্ঞান কিছুই বলে না। হয় কি না, বিনা পরীক্ষায় প্রমাণেরও আশা নাই। সেরূপ পরীক্ষা হইয়াছে কিনা জানি না।

হিন্দুর ন্যায় কৃষিজীবী জাতি নিরীহস্বভাব; কেন না, হিন্দুর দেশে কৃষিলব্ধ খাদ্য এত জন্মিয়া থাকে যে, মাংসের সংগ্রহের তেমন প্রয়োজন নাই। ইংরাজ প্রভৃতি উগ্রস্বভাব; কেন না, তাহাদের দেশে যে পরিমাণ শষ্য জন্মে, তাহাতে সকলের উদরের জ্বালা থামে না। কাজেই উহাকে নিষ্ঠুর পশুহত্যা ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। আজকাল স্বদেশজাত উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ একত্র করিলেও উহাদের আহার সঙ্কুলান হয়না; সেই জন্য উহারা স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশ যাইতেছে ও বিদেশের লোককে ঠ্যাঙ্গাইয়া তাহাদের মুখের আহার কাড়িয়া লইতেছে। এই ব্যবসাটাই নিষ্ঠুর; উদরের জ্বালায় তাহাদিগকে নিষ্ঠুর হইতে হয়। অনেকে বলেন, শীত প্রধান দেশে অধিক মাংস আবশ্যক। এ কথার মূল কি, তাহা জানি না। কথাটা বোধহয় বিজ্ঞানসম্মত নহে। ইওরোপীয়র মাংসাহারের সহিত তাহাদের দেশের শীতাধিক্যের মুখ্য সম্বন্ধ নাই। মাংস শীত নিবারণে সাহায্য করে না। উদ্ভিজ্জের অভাবে উহারা মাংস খায়; সেই মাংস সংগ্রহের জন্য তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া ক্রুরস্বভাবের হইতে হইয়াছে। মাংস ভোজন করিয়া উহারা ক্রূর স্বভাবের হয় নাই। সংগ্রহ ও ভোজন দুইটা পৃথক ব্যাপার। সংরহকারী নিষ্ঠুর; ভোজনকারী নিষ্ঠুর না হইতেও পারে। তবে যিনি ভোজন করেন, তাঁহাকেই অনেক সময় সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়, আবার স্বয়ং সংগ্রহ না করিতে পারিলে অপরের দ্বারা সংগৃহিত করিতে হয়; স্বয়ং অন্তরালে থাকিয়া সংগ্রহ কার্যের অনুমোদন ও সাহায্য করিতে হয়। সুতরাং তিনি গৌণভাবে এই নিষ্ঠুর ব্যবসায়ের জন্য দায়ী।

কথাটা দাঁড়াইল এই। মাংসভোজনে মানসিক বৃত্তিসকল উত্তেজিত হয়, তাহার সম্যক্ প্রমাণ নাই, তবে মাংস আহরণে নিষ্ঠুরতা আবশ্যক। এবং যিনি স্বয়ং মাংস আহরণ করেন না, অন্যের আহৃত মাংস ভোজন করেন, তিনিও গৌণভাবে নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নিয়া থাকেন। নিষ্ঠুরতা যদি অধর্ম্ম হয়, তিনি এই অধর্ম্মের অংশতঃ ভাগী, তাহার সন্দেহ নাই। আমরা উপরে বলিয়াছি, মাংস ভোজনে শরীরের বৃদ্ধি আছে; স্বাস্থ্যের উন্নতি আছে; দেশ কাল ভেদে মাংস নহিলে জীবন রক্ষাই চলে না। এমন আহার মাংসভোজনে অধর্ম্ম আছে কি

না? উত্তর দেওয়া তত সহজ নহে। ‘ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।’ নতুবা মনুষ্যসমাজে এত বিষয়ে এত মতভেদ কেন?

ইউটিলিটি ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে; লোকহিতই ধর্ম্ম। কিন্তু কোন একটা কার্য্য ধর্ম্ম সঙ্গত স্থির করিতে গিয়া যিনি ক্ষতি লাভ গণনার হিসাব করিতে বসেন, এই কার্যে লোকহিত হইবে কি না, বিবিধ যুক্তি ও বিবিধ বিজ্ঞানের সাহায্যে অঙ্কপাত করিয়া গণনা করিতে বসেন, তাঁহার মত নির্বোধ দ্বিতীয় নাই। এরূপ গণনা অসম্ভব। এই বিচারে গণনার আয় না লইয়া আমাদের সহজ ধর্ম্ম প্রবৃত্তি কি বলে, তাহার সন্ধান লয়াই বিধেয়। ইংরাজীতে যাহাকে কন্‌শান্‌স্ বলে, আমি তাহাকেই সহজ ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বলিতেছি। এ প্রবৃত্তিতেই যে আবার সকল লোকের পক্ষে একই রকম ও এই প্রণালীতেই যে সর্বত্র খাঁটি উত্তর পাওয়া যাইবে, কোথাও ঠকিতে হইবে না, তাহাও আমি বিশ্বাস করিনা। চোরের সহজ ধর্ম্ম প্রবৃত্তির ওপর নির্ভর করিয়া থাকিতে আমার সাহস হয় না। তবে ধর্ম্ম নিরূপণের সময় মোটের ওপর ইউটিলিটির হিসাব ও ক্ষতি লাভ গণনা অপেক্ষা ইহার উপর নির্ভরই শ্রেয়ঃ।

নিষ্ঠুরতা যতই আবশ্যক হউক না কেন, সাধু লোকের সম্বন্ধে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নিষ্ঠুরতার প্রতিকূল। নিষ্ঠুরতার দিকে

সাধু লোকের অনুরাগ হইতে পারে না। অথবা নিষ্ঠুরতায় যার যত বিরাগ, সে তেমনই সাধু। মনুষ্যের প্রতি নিষ্ঠুরতা সর্বতোভাবে সাধু প্রকৃতির পক্ষে কষ্টকর; ইতর জীবের প্রতি দয়াও সত্যসম্মত। এমন কি, সাদা চামড়ার মধ্যেও সময়ে সময়ে পশুপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়।

পাঠক মহাশয় ক্ষমা করিবেন, শ্বেত চর্ম্মের অভ্যন্তরে যে বিশুদ্ধ মানব প্রেম বর্ত্তমান থাকিতে পারে, সহস্র ঐতিহাসিক উদাহরণ সত্ত্বেও আমি ইহা সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করিতে পারি না। এই ভয়ানক অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কার হইতে মুক্তিলাভ আমার পক্ষে এরকম অসম্ভব। ইতিহাস ও কোন একটা পাশ্চাত্য ফিলানথ্রপির প্রকৃত উদাহরণ সম্মুখে ধরিলেই সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ- মধ্যে উনিশ শত বতসরের খ্রীষ্টানির ধারাবাহিক রক্তাঙ্কিত চিত্রপট সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমাকে অবসন্ন করিয়া ফেলে।

মানবপ্রেম সম্বন্ধে যাহাই হউক, ইউরোপের লোকেও পশুক্লেশনিবারিণী সভা স্থাপন দ্বারা এবং পাস্তুর-প্রবর্ত্তিত চিকিৎসাপ্রণালীর বিরোধাচরণ করিয়া পশুপ্রেমের পরিচয় দেন; কেহ কেহ বা আমিষাহার বর্জ্জনের ফ্যাশন তুলিয়া ইন্দ্রিয়সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখান। সুতরাং জীবহিংসা ও জীবের প্রতি নিষ্ঠুরতা যে সাধু জনের সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তিকে পীড়া দেয়, তাহাতে সংশয় নাই। ইউটিলিটির হিসাব ত্যাগ করিয়া এই ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপর নির্ভর করিলে ধর্ম্মমীমাংসা যদি সুকর হয়, তবে জীবহিংসা অধর্ম্ম। মাংস ভোজনে জীবহিংসার প্রশ্রয় দেয়, সুতরাং জীবহিংসা অধর্ম্ম। জীবের মাংস সুস্বাদু ও পুষ্টিকর হইতে পারে; তথাপি জীবহত্যা অধর্ম্ম। আমাদের হিন্দু সমাজের এ বিষয়ে মত কি, তাহা বিবেচ্য। 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' এই মত এই দেশেই প্রচারিত হইয়াছিল; খ্রীষ্টানের দেশে নহে। ব্রাহ্মণ-শাসিত, সমাজের উচ্চতর স্তরে হিংসার প্রতি যতটা বিরাগ আছে, পৃথিবীর অন্য কোথাও ততটা আছে কিনা জানিনা। অন্ততঃ এদেশের বৃহৎ মানবসম্প্রদায় যেভাবে জীবহিংসা ও আমিষাহার বর্জ্জন করিয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোথাও তেমন দেখা যায় না। অথচ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত অহিংসাধর্ম্মের স্থানে স্থানে বিরোধ দেখা যায়। এই ঘটনাটার আর একটু বিচার আবশ্যক।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মূল বেদ। বেদ পশুহিংসার বিরোধী নহে। বৈদিক যজ্ঞে পশুহত্যার ব্যবস্থা ছিল। ঋষিরা মাংসভোজী ছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, একালে যে মাংস হিন্দুর পাতিত্যজনক, ঋষিদের নিকট তাহাও উপাদেয় ছিল। একালে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক উপাসনা বৈদিক যজ্ঞের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। দেবোদ্দেশে পশুহত্যা এই সকল উপাসনাতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। একালে অনেক ব্রাহ্মণসম্প্রদায় মাংস বর্জন করিয়াছেন, অনেকে দেবোদ্দিষ্ট মাংস ভিন্ন অন্য মাংস খান না, তথাপি মাংস ভোজন হিন্দুর বর্জনীয়, এরূপ ব্যবহার নাই। পিতৃশ্রাদ্ধে মাংস ব্যবহার অদ্যাপি প্রচলিত, আয়ুর্বেদ ও বৈদিক শাস্ত্রে বিবিধ মাংসের গুণকীর্ত্তন ও ব্যাখ্যা আছে। বলা বাহুল্য, ধর্ম্ম বিরুদ্ধ হইলে আয়ুর্বেদ এইরূপ বিধানে সাহসী হইতেন না। শাস্ত্রে স্পষ্ট নিষেধ নাই, স্থান বিশেষে স্পষ্ট ব্যবস্থা আছে ; অথচ ধর্ম প্রবৃত্তির মাংস ভোজনের বিরোধী; এ স্থলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত অহিংসা ধর্ম্মের সম্বন্ধ বিষয়ে খটকা উপস্থিত হয়।

এই খটকা বহুদিন পূর্বেই উপস্থিত হইয়া ছিল। অন্ততঃ মনুসংহিতা ও মহাভারত রচনার সময়ে শাস্ত্রের সহিত সহজ ধর্ম্মের এই বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হইয়া ছিল। অহিংসা ধর্ম্ম বৌদ্ধগণের প্রবর্তিত মনে করিবার সম্যক কারণ নাই। বুদ্ধদেব স্বয়ং মাংস ভোজন একেবারে নিষেধ করিয়া যান নাই। শ্রমণ সম্প্রদায়ের মধ্যে মাংস ভোজন প্রথা ছিল। এ কালের বৈদেশিক বৌদ্ধেরা মাংস ভোজনে কুণ্ঠিত নহেন। তবে করুণাসিন্ধু ভগবান শাক্যমুনি বৈদ্যিক যজ্ঞে পশু হত্যার নিন্দা করিয়াছিলেন; এদেশে অহিংসা ধর্ম্ম প্রচলনের সহিত তাহার সম্বন্ধ অস্বীকার করিলে চলিবে না।

মনুসংহিতাকার বড়োই গোলে পড়িয়াছিলেন। তিনি বৈদিক ধর্ম্মের পক্ষপাতী; বৈদিক আচার ব্যবহার রাখিবার জন্য তাঁহার চেষ্টা; অথচ তাঁহার মনে বলিতেছে জীবহত্যা কাজটা ভালো নহে। বৈদিক ব্যবহার লোপে তিনি সাহসী হয়েন নাই; যজ্ঞ অনুষ্ঠান ভিন্ন অন্যত্র জীব হত্যার তিনি নিন্দা করিয়াছেন; শেষ পর্যন্ত বলিয়াছেন – "প্রবৃত্তিরেখা ভূতানং নিবৃত্তিস্ত মহাফলা।"

এই মীমাংসা একালের লোকের পছন্দ হইবে না। এ কালের লোকে বলিবেন, মনুসংহিতাকার ভীরুতার পরিচয় দিয়াছেন। ধর্ম্ম প্রবৃত্তির আদেশ সত্ত্বেও তিনি প্রাচীন শাস্ত্রের আদেশ লঙ্ঘনে সাহসী হয়েন নাই। এ কালের যুক্তি যে, ধর্ম নির্ণয়ে শাস্ত্রের ব্যবস্থা গ্রাহ্য নহে। সহজ ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বা কন্‌শেন্‌স্ এক কথা। হিন্দু সমাজ শাস্ত্রের আদেশ লঙ্ঘনে সাহসী হয় না; কাজেই সংস্কারকগণ হিন্দু সমাজের নিপাত কামনা করেন। আমরা হিন্দু সমাজের ওকালতিতে প্রবৃত্ত হইব না। তবে এই বিবাদটার সমালোচনা করিব। বিষয়টা আলোচ্য; কেননা, কেবল হিন্দু সমাজ কেন, সকল সমাজেই শাস্ত্রের সহিত ধর্ম্ম প্রবৃত্তির এই বিরোধ দেখা যায়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মূল বেদ। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম শব্দটা ইচ্ছা পূর্বক ব্যবহার করিতেছি। কেননা, আধুনিক হিন্দু ধর্মে বেদ বিরোধী অনেক উপাদান প্রবেশ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মূল বেদ। 'ধর্ম্ম' শব্দ ও 'বেদ' শব্দের একটু ব্যাখ্যা আব্যশক। ধর্ম বলিলে ঠিক রিলিজন বোঝায় না। রিলিজনের মুখ্য সম্বন্ধ ঈশ্বর, পরকাল ও অতিপ্রাকৃতের সহিত, ধর্মের সম্বন্ধ মনুষ্যের সমগ্র জীবনের সহিত। আমরা সম্পূর্ণ্য ঐহিক স্বার্থের জন্য আহার বিষয়ে ডাক্তারের ব্যবস্থা লই, রাজাকে নির্দিষ্ট খাজনা দিয়া থকি; সম্পত্তিতে স্বত্ব লইয়া প্রতিবাদীর সহিত মকোদ্দমা

করি। এসকল কার্য রিলিজনের অন্তর্গত নহে। কিন্তু ইহা খাঁটি ধর্মের অন্তর্গত। এই সকল কার্য যথাবিধানে সম্পাদন না করিলে অধর্ম। ডাক্তার ও উকিল ও ম্যাজিস্ট্রেট ব্রাহ্মণের শাস্ত্রানুসারে ধর্ম ব্যবস্থাপক। ব্রাহ্মণের ধর্ম্মশাস্ত্রে কিয়দাংশ ডাক্তারি ও কিয়দাংশ আইন। অনেকে এ জন্য বিস্মিতঃ হন, অনেকে গালি দেন। আমরা বিস্ময় বা গালি দেবার কারণ দেখিনা। ব্যবহার সম্মত হইতেছে কিনা, সে কথা স্বতন্ত্র। ধর্ম শব্দটার রিলিজিয়ন অর্থেই ব্যবহার করিতে হইবে, এমন কোন আইন নাই। ব্রাহ্মণ্যের ধর্ম মানুষের সমগ্র কর্তব্যসমষ্ঠি। বেদ শব্দে সঙ্কীর্ণ অর্থে কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথির সংগ্রহ বুঝায়। প্রশস্ত অর্থে বেদ শব্দ গ্রহণ করা আবশ্যক। ইংরাজী প্রতিশব্দ tradition অনেকটা কাছাকাছি আসিতে পারে। আরও প্রশস্ত করিয়া মন্যষ্যজাতির অথবা আর্যজাতির ধর্ম্ম মার্গে ও কর্ম্ম মার্গে সমগ্র অতীত কাল ধরিয়া উপার্জিত অভিজ্ঞতার নাম বেদ। এই বেদ অপৌরুষেয়, নিত্য, অনাদি। ইহার আদি পাওয়া যায় না। অন্ততঃ মনুষ্য জাতির যেদিন আরম্ভ, এই অভিজ্ঞতা সেদিন আরম্ভ। কিংবা ইহার আরম্ভ আরও পূর্বে। ব্রাহ্মণের শাস্ত্র খুঁজলে ডারুইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব মিলিতে পারে, এরূপ আমি বিশ্বাস করিনা। কিন্তু প্রাকৃতিক অভিব্যক্তিতে ব্রাহ্মণের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, ইহা আমর দৃঢ় বিশ্বাস। পৃথিবীর অন্য কোন মনুষ্য সম্প্রদায়ের এই বিশ্বাস নাই। ব্রাহ্মণের ইহাই প্রধান গৌরব। ব্রাহ্মণের মতে মানুস্যের একদিনে সহসা সৃষ্টি হয় নাই। মনুস্যের অভিজ্ঞতাও একদিনে জন্মে নাই। কোন তারিখে এই অভিজ্ঞতার বীজ বপন করা হইয়াছিল, তাহার নির্ণয় নাই। হয়ত জগতে যেদিন আদি, এই অভিজ্ঞতারও সেইদিন আরম্ভ। কাজেই বেদ অনাদি; ঋষিগণ বেদের দ্রষ্টা বা শ্রোতা; স্বয়ং জগৎনিয়ন্তা ব্রহ্মা ও বেদের স্রষ্টা নহে। খ্রীষ্টানি হিসাবের সৃষ্টি ব্রাহ্মণ মানিতেন না। জগতের সৃষ্টি হয় নাই; বেদেরও সৃষ্টি হয় নাই। বেদ অপৌরুষেয়।

মনুষ্য তাহার প্রাচীন বহুকালের উপার্জিত অভিজ্ঞতার ফলে কতগুলি সামাজিক নিয়মের অধীন হইয়া সমাজ বাঁধিয়া বাস করে। এই সকল নিয়মের পরিচালনার ভার কতক রাজার উপর, কতক যাজকের উপর, কত জনসাধারণের উপর। কিন্তু তাহারা পরিচালক। কেহই স্রষ্টা নহেন। এই সকল নিয়ম প্রকৃতির অঙ্গীভূত; প্রাকৃতিক নিয়মে বিকাশ পাইয়াছে, বিকৃত হইতেছে, লয় পাইবে। কাজেই ব্রাহ্মণের চক্ষে এই সকল সামাজিক নিয়ম অর্থপূর্ণ ও মাহাত্ম্যে মন্ডিত। সহস্র যুগের অতীত ইতিহাস এই সকল সামাজিক নিয়মের শনৈঃ শনৈঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই সকল নিয়মের সমষ্টি ধর্ম্ম। প্রকৃতির মহাযন্ত্রে যে নিয়ম, যে শৃঙ্খলা, যে ব্যবস্থা আছে, মানব সমাজের অন্তর্গতঃ নিয়ম সমষ্টি তাহার অন্তর্গতঃ। ধর্ম জগদ্বিধানের একটা ভাগ। মাধ্যাকর্ষণের ওপর তোমার আমার হাত নাই; সামাজিক নিয়মের ওপর আমাদের হাত নাই; ধর্ম অনাদি ও সনাতন ও পুরাতন।

আচার অনুষ্ঠান পরিবর্তনশীল, ধর্ম্মের মূর্তি পরিবর্তনশীল, কিন্তু ধর্ম্ম পুরাতন। মাধ্যাকর্ষণে ব্যাভিচার নাই, তথাপি ধারা পৃষ্ট যুগব্যাপিয়া বিধির বিকারে বিকৃত হইয়াছে। সামাজিক নিয়মে ব্যাভিচার নাই, ধর্ম সনাতন,

তথাপি আচার অনুষ্ঠান পরিবর্তনশীল, ধর্মের মূর্তি মানুষের নিকট দেশ কাল ভেদে বিভিন্ন। দেশকাল ভেদের নীতি, ইংরাজীতে যাহাকে বলে মরালিটি, তাহাও পরিবর্ত্তিত হয়; দেশকাল ভেদে আচারও পরিবর্তিত হয়। মনুষ্যসন্তানের পুরাতন জ্ঞান সমষ্টিরূপী বেদ মধ্যে ধর্ম্ম নিহিত আছে; অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি সহকারে ধর্মের পরিসর বৃদ্ধি পাইতেছে। ব্রাহ্মণ একাধারে রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল। অতীতের প্রতি ভক্তি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কর্ষিত হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট ফলপ্রসু হইয়াছে। সেই ভক্তি সমাজের গতিরুদ্ধ করে নাই। মনুর সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজ সনাতন ধর্মের মার্গে অব্যাহত ভাবে চলিয়াছে; বিনা রক্তপাতে বিনা কোলাহলে প্রাচীন আচার প্রাচীন অনুষ্ঠান ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। যে ব্রাহ্মণকে উন্নতির বিরোধী বলে সে ভারতবর্ষের ইতিহাসে অধ্যয়ন করে নাই; সে পৃথিবীর অন্য দেশের ইতিহাস পড়ে নাই; সে চক্ষু সত্ত্বে অন্ধ।

কথা প্রসঙ্গে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। পাঠক মার্জ্জনা করিবেন। মনুষ্য প্রকৃতির নিয়োগে জীবন রক্ষার জন্য চিরকাল পশু মাংস ভোজন করিয়া আসিতেছে। ইহাতে এক হিসাবে অধর্ম নাই। আমাদের পূর্বপুরুষেরা সকল মনুষ্যের মতোই নির্বিকার চিত্তে মাংস ভোজন করিতেন; কেননা, তাহাই প্রকৃতির ব্যবস্থা, তাহাই মানবের প্রাচীন ধর্ম। দেবতার প্রীতির জন্য পশু বলি হইত; পৃথিবীর সর্বত্র এই ইতিহাস; একেশ্বরবাদী ইহুদীরাও জোহবার মন্দিরে বিভিন্ন প্রাণী হত্যা করিত। এই কারণে বৈদিক যজ্ঞে হিংসার ব্যবস্থা। শষ্যপুণ্য ভারত ভূমিতে কৃষি ভিত্তি পরায়ণ আর্য সন্তানের আর তেমন জীব হিংসার প্রয়োজন হয় নাই; জীবের প্রতি দয়াবৃত্তির স্বাভাবিক নিয়মে বিকাশ হইয়া ছিল। ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অন্তঃকরণে নুতন ভাবে উদ্বোধন করিল। আশা করিতে পার, মনুষ্য বিজ্ঞান বলে একদিন এমন বলিষ্ঠ হইবে, যেদিন তার নিষ্ঠুর হিংসার প্রয়োজন হইবনে না, সেদিন সমগ্র পৃথিবীতে অহিংসা পরম ধর্ম বলিয়া গৃহীত হইবে। এখনও মনুষ্যের সে অবস্থা হয় নাই। মনুষ্যকে জ্ঞানাভাবে ও শক্তির অভাবে অদ্যাপি প্রাচীন হিংসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইয়াছে। অতীতের প্রতি ভক্তি পরায়ণ মনুসংহিতাকার মনুষ্যের প্রাচীন ধর্মের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। নূতন ধর্ম্মকে আগ্রহের সহিত সম্ভাষণ করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রকৃতি কর্তৃক বঞ্চিত দুর্বল ক্ষুধার্ত মানবকে এই পরম ধর্মের উপদেশ দেওয়া নিস্ফল। অগত্যা মনুসংহিতাকারের সহিত বলিতে হয় –

প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্ত মহাফলা।

('পুণ্য', বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য ১৩০৫)

হয়তো এখন জীবাশ্ম হয়ে আছি

- নবনীতা দেবসেন

সাহিত্যিক

দুগগা দুগগা ! এ পথে আমি পা ফেলিনি কোনোদিন, অভিজিৎ-এর স্বপ্নের মায়ায় ভুলে এসে পড়েছি। বিজ্ঞান আমার ভয়ের ঠাঁই। সেই জন্যেই অভিজিৎ-এর উদ্দেশ্যটা আমার কাছে জরুরি। বিজ্ঞানকে ঘরের লোক ক'রে নিতে হলে, তাকে ঘরের ভাষায় চিনতে হবে। বিজ্ঞানের সঙ্গে মাতৃভাষার যোগ ঘটাতে নজর দিয়ে গিয়েছেন আমাদের বাঙালির উচ্চশিক্ষার প্রথম যুগের জরুরি পিতৃপ্রতিম বৈজ্ঞানিকরা, সুন্দর আর সুষ্ঠু ভাষা ছিল তাঁদের। বিজ্ঞানের শক্ত বিষয় সরলভাবে বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা ছিল তাঁদের । সাহিত্য কাকে বলে আমি আজও জানিনা । মানুষের কাছে মানুষের বোধকে যা সুচারুভাবে, কল্পনা আর যুক্তির যুগ্ম প্রভায় উজ্জ্বল করে পৌঁছে দিতে পারে, তাকেই আমি সাহিত্যের লক্ষ্য বলে মনে করি । আমাদের পিতৃপ্রতিম বৈজ্ঞানিকরা বিজ্ঞান নিয়ে ঠিক সেই ভাবেই আমাদের কাছে এগিয়ে এসেছিলেন । আমাদের অপ্রস্তুত মনের সঙ্গে আত্মীয়তা ঘটাতে চেয়েছিলেন মানুষের নবলব্ধ সম্পদ, আধুনিক বিজ্ঞানের। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, এঁদের কলমে বাংলা ভাষার কী আদর, কী মহিমা!

গঙ্গা, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? মহাদেবের জটা হইতে। কিন্তু গল্পটা মহাদেবের নয়, গঙ্গানদীর উৎপত্তির।

রবীন্দ্রানাথ তাঁর বিশ্বভারতীর পাতলা আর গভীর ছোট ছোট বইগুলিতে, বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহে, এই একই চেষ্টা করেছেন । শিল্পসম্মত, সরল বাংলাভাষায় সাধারণ মানুষের হৃদয়ে আর মস্তিষ্কে জ্ঞান বিজ্ঞানের সহজ স্থান করে দিতে চেয়েছেন । অতি চমৎকার বইপ্রকাশ করেছেন আমাদের মতো সাধারণ পড়ুয়াদের জন্য। তাতে ইতিহাস, ধর্ম, শিল্প, সংস্কৃতির সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে এসেছে মহাবিশ্বের মহাকালের কথা, বিজ্ঞান। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের বিচ্ছুরণ বাংলায় সর্বজনে আদৃত হয়েছে। আমি মানি যে, বিজ্ঞানের অনুশীলন মাতৃভাষায় হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে আজকের ভারতের গ্রামগ্রামান্তে, যেখানে শিক্ষা আজও পৌঁছোচ্ছে অতি বিলম্বিত লয়ে। বৃহৎ বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে তো, ইংরিজি চাই'ই । আন্তর্জালের ভাষা ইংরিজি, আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরিজিতে বিজ্ঞান তাদের পড়তেই হবে । এঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী, বাণিজ্য, আইন, যা পড়তে চাইবে, মুল পাঠ্যবই ইংরিজিতে । তাই ইংরিজি ভাষাজ্ঞান এখন আগের চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

যারপরনাই দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করেছি, আমাদের শিশুরা প্রথম থেকেই মাতৃভাষায় অরুচি আস্বাদন করে, বইয়ের সঙ্গে দুরত্ব সৃষ্টি হয়, বাংলা শিশুপাঠ্য স্কুলপুস্তকের নিদারুণ অসুন্দরতায় । গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের এই অসুবিধেটা ডুবে যায় আরো অনেক বড় বড়, প্রতিদিনের বেঁচে থাকার সংগ্রামের মধ্যে, রাস্তার অভাব, জলের অভাব, শৌচালয়ের অভাব, মিড-ডে মিলের বাস্তবতায় বইয়ের নান্দনিকতা তুচ্ছ হয়ে যায় । কিন্তু একটা চিত্তাকর্ষক সুশ্রী বই হাতে পেলে কোন শিশুর না মন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ? বলতে লজ্জা করছে, আমার স্কুলের বই লেখার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, আমাদের বাংলা স্কুলপাঠ্য বইয়ের বড় বড় প্রকাশকেরা সব চেয়ে কম দামের , কাঁচা হাতের শিল্পীদের দিয়ে পাঠ্য বইয়ের ছবি আঁকান, এবং সব চেয়ে কম রঙ ব্যবহার করেন । বাচ্চাদের হাতে তুলতেই ইচ্ছে করেনা সেই বোরিং, বর্ণহীন, শ্রীহীন বই, পড়া দুরস্থান! ইংরিজি পাঠ্য বইয়ের বেলায় কিন্তু তাঁর বিপরীত । সুন্দর ছবি, রঙচঙের অভাব হয় না । কাগজ ভালো । চিত্তাকর্ষক প্রস্তুতি থাকে । আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের মাতৃভাষায় প্রকাশকেরাই সংকীর্ণ মনে, কার্পণ্য আর অবহেলার সঙ্গে মাতৃভাষায় পাঠ্যবই ছেপে, নিজেদের বাচ্চাদের মাতৃভাষা থেকে দুরে ঠেলে দিচ্ছেন । বাচ্চা বয়েসে যদি মাতৃভাষাকে ভালো না'ই বাসতে শিখলো, তাহলে তারা বড় হয়ে কীসের জন্য বাংলায় বিরচিত বিজ্ঞানে সাহিত্যরস খুঁজতে যাবে? কিম্বা সাহিত্যে বিজ্ঞান?

সাহিত্যে জাল পেতে, তার শরীরে লুকিয়ে থাকা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বটানি ভুবিজ্ঞান ধরা, এটা একটু গোলমেলে বাপু । যেমন, ধরা যাক, আমি মনে করি না "সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা", কিম্বা "জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে", অথবা "মাটির বুকের মাঝে বন্দী যে জল লুকিয়ে থাকে"

ইত্যাদি আমাদের বিভিন্ন বিজ্ঞানের কথা বলছে। বৈজ্ঞানিকরা তার টিকি টেনে ধরতে পারলেও আমরা পারবো না, চাইবোও না।

এই মহান বিশ্ব প্রকৃতিতে বিজ্ঞানই তো সর্বস্ব । প্রকৃতির রূপ অন্তরে-অন্তরে তো বিজ্ঞানেরই তৈরি, পুর্ণিমার বাঁধভাঙ্গা চাঁদের আলো, কালবৈশাখীর আকাশ ঢাকা কালো মেঘ, শ্রাবণের ঝরঝর বৃষ্টিতে দাদুরীর ডাক, গ্রীষ্ম রুদ্র মুর্তি, অমাবস্যা পুর্ণিমার অলখ টানে সমুদ্রের উথালপাথাল, সাহিত্য তাদের নিয়ে যতই মাতামাতি করুক, কোনটাই বা বিজ্ঞানের আওতার বাইরে?

কিন্তু তা ব'লে সাহিত্যে তার ব্যবহার আর বিজ্ঞানে তার ব্যবহার তো এক নয়। দুটির উদ্দেশ্য আমার কাছে দু-রকম । এক জায়গায় আমি চাইছি দেখতে, শুনতে, স্পর্শ করতে, গন্ধ নিতে, স্বাদ নিতে, আরেক জায়গায় আমি চাইছি মগজ দিয়ে বুঝে নিতে। "কেন?" এবং তার উত্তর, "কীভাবে?" আমার বোধবুদ্ধিতে এই শব্দ দুটি বিজ্ঞানের গোড়ার কথা । সাহিত্যের মোটেই মাথা ঘামানো নেই এই কেন, আর কীভাবে নিয়ে । বিজ্ঞানের অনুসন্ধান, আর সাহিত্যের ভাষা, দুই শক্তি একটু ভালোবেসে চেষ্টা করলেই হাত ধরাধরি করে চলতে পারে, তার মানে কিন্তু এই নয় যে বিজ্ঞান আর সাহিত্য মিলে মিশে এক হয়ে গেল । আমি বলতে চাই, ভালোবেসে সাহিত্যকে বিজ্ঞান আখ্যা দেওয়া যায় না, কিন্তু চেষ্টা করলে বিজ্ঞানকে সাহিত্যের স্তরে উন্নীত করা যেতেই পারে । তবে সে সৃষ্টি কত উন্নতমানের সাহিত্য হবে, তার ধারণা নেই আমার । প্রেম তো বিজ্ঞান দিয়ে বিচার, বর্ণনা, বিশ্লেষণ করা যায়, কিন্তু অনুভব করা যায় কি?

সাহিত্য অনুভবের জিনিস, বিজ্ঞান বোধগম্যতার । বিজ্ঞান-সাহিত্য সৃষ্টি করতে গিয়ে আমি যদি আমার বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং তত্ত্ব পাঠকের কাছে পৌঁছেই দিতে না পারি তা হলে তো আমার বিজ্ঞান আর সাহিত্য দুইই গোল্লায় গেল! 'আ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম' কি সবাই লিখতে পারি? আর স্টিফেন হকিং তো সাহিত্য সাধনা করতে নয়, সর্বসাধারণের জানা বোঝার জন্য সরল ভাষায় বিজ্ঞানই লিখছিলেন, আমাদের মতো বিজ্ঞান জ্ঞানান্ধদের চক্ষু উন্মীলনের জন্য । (সত্যি বলতে, বইটা কিন্তু পুরোটা অবৈজ্ঞানিকদের কাছে খুব সহজবোধ্য বলে মনে হয়নি আমার!) মাতৃভাষার সাহিত্যরসের মাধ্যমে বিজ্ঞান পরিবেশন তখনই সার্থক যদি তার ভাষা সর্বজনগ্রাহ্য হয়, সাহিত্যের পন্ডিতদের বা বিজ্ঞানের বড়কর্তাদের মনোরঞ্জনের জন্য দোতলার বারান্দায় আটকে না থাকে ।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে গেল অনেক দিন আগেকার এক হইচই কান্ড । ষাটের দশকের গোড়ায়, আমরা যখন সেখানে ছাত্র তখন কেম্ব্রিজের আকাশ বাতাস গরম করে চলেছিল এক তুমুল বিতর্ক, অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক, এবং সার্থক ঔপন্যাসিক সি পি স্নো-এর রীড লেকচার, সেই প্রসিদ্ধ "দ্য টু কালচার্স" বিতর্ক ।

সেখানে তিনি বলেছিলেন একদিকে বিজ্ঞান, আর একদিকে সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি, বিদ্বজনের এই দুই মেরুর মধ্যে সেতুবন্ধন দরকার, বৈজ্ঞানিকেরা ডিকেন্স, শেক্সপিয়র চেনেন না, অবিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের অ আ ক খ জানেন না । সমাজের পক্ষে এটা ক্ষতিকর । এতে ভারসাম্য বজায় থাকে না । বিজ্ঞান এবং কলার মধ্যে হৃদয়ের ভাগাভাগি চাই। তাতে কেম্ব্রিজে সাহিত্যের অধ্যাপক, আর ডাকসাইটে সমালোচক এফ আর লীভিস রেগে গিয়ে আরেকটি বক্তৃতাতে সি পি স্নো-কে সক্রোধ আক্রমণ করে বলেছিলেন, "বিজ্ঞানের জনসংযোগ অফিসার এসেছেন!" আরো কিছুদিন পরে, মানে আজ থেকে পঞ্চাশ-বাহান্ন বছর আগে, ওই বইয়ের নতুন সংস্করণে সি পি স্নো লিখেছিলেন, একটি তৃতীয় কালচারের কথা, যেটা সম্ভব, যেটি পারবে আরেকটু দূরত্ব কমিয়ে আনতে বিজ্ঞানের সঙ্গে কলার বিভক্তির। এবং যা বর্তমান বিশ্বের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।

সেটি এখন অনেকটাই কিন্তু সিদ্ধ হয়েছে, বিশেষত মার্কিন দেশে, তৃতীয় কালচারের উৎপত্তি হয়েছে, লিখিত হচ্ছে সর্বজনগ্রাহ্য বই যা বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের সেতুবন্ধনের কাজ করে। সহজ সাবলীল ভাষায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে জনগণের বোধগম্য ক'রে প্রচুর মধ্যপন্থী, প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান বিষয়ক, পাঠসুখকর, আকর্ষণীয়, সচিত্র, সহাস্য বই লেখা হচ্ছে। তুমি আমি যে কেউ পড়লেই বৈজ্ঞানিক সত্য বা সমস্যাটির মুখ চিনে নিতে পারবো জীবন থেকে। কিন্তু তাকে কি আমরা সাহিত্য বলব? না, বিজ্ঞান বিষয়ক সরল গদ্য রচনাকে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চাই বলব? এই প্রশ্নের জবাব আমার কাছে নেই।

আমাদের বিজ্ঞানভাষ- মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের চর্চা চালু করুক, নতুন ভাষা সৃষ্টি করুক, সাহিত্যের সাঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধুক, কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে বিজ্ঞান খুঁজতে বেরুনোয় আমার আপত্তি। "প্রাণে খুশির ঢেউ জেগেছে" কি সহসা হরমোনের তরঙ্গায়িত হবার বর্ণনা? কিংবা "আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাধুরী"-কে কি জগৎবিচ্ছিন্ন ডিপ্রেশনের মনোরোগ বলবেন? আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, বিজ্ঞানকে সাহিত্য করে তোলার শক্তি বাংলার সূক্ষ্মমনা বৈজ্ঞানিকদের আছে, অনেক আধুনিক, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের চমৎকার বাংলা ভাষণ শুনেছি, অপূর্ব বাংলা নিবন্ধ পড়েছি। উপকৃত হয়েছি। কিন্তু তার বিপরীত গতি, অর্থাৎ সাহিত্যের মধ্যে বিজ্ঞানের অনুসন্ধান আমার বোধ বুদ্ধিতে স্পষ্ট নয়। শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিকেরাই ধরতে পারবেন রামধনুর বৈজ্ঞানিক মাহাত্ম্য। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার আমি একশোয় একশো কুড়ি ভাগ সপক্ষে। কিন্তু সেটা হবে আমাদের মতো আমজনতার জন্য। যারা ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক হতে চায় তাদের কিন্তু ইংরিজি ভাষাতেই পড়তে হবে উচ্চশিক্ষার জন্য। তারপরে তারা লিখুক সরল বাংলায় আমাদের জন্য। আমরা সাধারণ মানুষেরা বিজ্ঞান এত কম জানি, এত কম বুঝি, যে নিজেদের বিজ্ঞান-নিরক্ষর বলেই বিশ্বাস না করে উপায় নেই।

এখন ত্রিভুবনের জন্য সরল শিক্ষাপদ্ধতি বেরিয়েছে, কম্পিউটারের অনুসন্ধান। এখন সবাই ডাক্তার, সবাই বিজ্ঞানী, সবাই সাহিত্য সাধক। যেটুকু দরকার, চেঁছে তুলে নাও। মোটামুটি ইংরিজিটা জানলেই হবে, গভীরে যাবার দরকার নেই। আমাদের প্রিয় সাংস্কৃতিক অভিযান, বিজ্ঞানভাষ, বাংলার মন বুদ্ধিকে সেই অন্ধকূপ থেকে মুক্ত করুক। আলোয় নিয়ে চলুক। অভিজিৎ এবং তাঁর সহ-স্বপ্নদর্শীদের অভিনন্দন জানাই।

সম্প্রতি শ্রীজাত'র একটি সুদীর্ঘ কবিতায় জীবনের ছবির মধ্যে বিজ্ঞানভাষ বড় সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সেটি থেকে সামান্য একটু অংশ এখানে তুলে দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না। সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের এমন স্বচ্ছন্দ কাব্যিক মিলন তো সহজে চোখে পড়ে না। (রবীন্দ্রনাথের অবিশ্যি অনেক উদাহরণ আছে!) কিন্তু একে আপনি কবিতায় বিজ্ঞান চর্চা বলবেন? না শুধুই জীবনের গভীরে নেমে উৎসারিত সৎ কবিতা? কবিতার নাম, রোদছায়াগ্রাম।

"আমাদের ছিল কথা বলবার কথা
আর ছিল কিছু শোনানোর মতো গান।
পাথরের মুখে শ্যাওলা চুলের জটা
আপাতত তাতে বন্ধক রাখি প্রাণ।
উঠি যদি, কোটি প্রস্তর যুগ ঠেলে?
নেমে আসি নিচে? লাভামুখ খুলে যায়।
মাটি খুঁড়ে যদি শাব্দ করোটি মেলে,
বুঝে নিও ছিল বলারই অভিপ্রায়।
হয়তো এখন জীবাশ্ম হয়ে আছি,
সাবধানে ঘোরে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা
ছিলাম কখনো কথাদের কাছাকাছি
এখন যেখানে রক্ষকদের ডেরা ।
যদি বা একটি শব্দও খসে পড়ে
তা থেকে আবার জন্মাই চুপিচুপি—"

এই পুনর্জন্মের মন্ত্রেই শিল্পের সঙ্গে বিজ্ঞানের গাঁটছড়া বাঁধা।